মুসলমানি

**

সাইদ হোসেন

Personal website: www.sayedhossain.com

@ *Musolmani,* is a chapter from the book entitled *Amar Chelebela,* a bengali book by Sayed Hossain, March, 2010.

।। ১ ।।

যে ভাবে শুরু

সময়টা ঠিক মনে পড়ছে না, তবে ১৯৭৪ হতে পারে । দেশ কেবল স্বাধীন হয়েছে, স্বাধীনতার হাঁকডাঁক তখনো কেটে যায়নি । ক্লাস ফোরে পড়ি তখন রামকৃষ্ণ মিশন সকুলে । আমাদের সামীবাগের বাসা থেকে একটু এগুলেই রামকৃষ্ণ মিশন । বিখ্যাত মনীষি রামকৃষ্ণের নামাকরণে মিশনটা গড়ে উঠেছে । বিরাট এলাকা ঘিরে এদের কর্মকান্ড । মিশনে ঢুকতেই প্রথমে পড়বে স্কুলটা । এদিকে আশ্রম । ওদিকে বিরাট মন্দির আর মন্দিরের সামনে মিশনের পুকুর । শক্ত মজবুত শান দিয়ে পুকুর ঘাট বাধানো হয়েছে ।

ক্লাস ওয়ান থেকে ফাইব পর্যন্ত পড়েছি রামকৃষ্ণ মিশনে, তারপর সেন্ট গ্রেগরীতে চলে যাই । পরবর্তিতে সেন্ট গ্রেগরী থেকে মেট্রিক পরিক্ষা দেই । লক্ষীবাজারের মোড়ে দাঁড়িয়ে আছে সেন্ট গ্রেগরীজ হাই সকুল । যেমনি পুরান, তেমনি আভিজাত্যে ভরা । কত যে স্মৃতি জড়িয়ে আছে সেন্ট গ্রেগরীকে ঘিরে, সে কথা পরে আবারো লিখবো ।

রামকৃষ্ণ মিশনে পড়বার সময় যে কথাটা আমাকে তাড়িয়ে ফিরতো আর তা হলো মুসলমানি । মুসলিম ঘরের ছেলেদের মুসলমানি করতেই হবে, এর কোন বিকল্প মুসলিম শাস্ত্রে নেই । তখন মনে হতো, মেয়ে হয়ে জন্মালে এ সবের বালাই থাকতো না ।

বাসায় প্রায়ই মুসলমানি নিয়ে কথা হতো । আম্মা-খালারা কথা বলতেন । আব্বাকে দেখলাম একদিন চাচার সাথে কথা বলছে মুসলমানি নিয়ে । আমি নীরবে শুনে যেতাম, কিছু বলতাম না । আমি কিছু না বললেও মা বুঝতো সবকিছু । তখন আমাকে জড়িয়ে বসে থাকতো, যতক্ষণ না মাথা তুলছি । তখন বুঝতে পারিনি মা'র ভালবাসা কত অমূল্য । সাত-সমুদ্র পেরিয়ে হয়তো মুক্তো আনা যাবে, কিন্তু মা'র শুকনো হাত কখনো ফিরে পাওয়া যাবে না ।

তখন আমার ছোট মামা নারায়নগঞ্জে থাকতেন পরিবার নিয়ে । উনার দুই ছেলে, দুই মেয়ে । ছোটো ছেলেটা আমার সমান, নাম টগর (ছদ্মনামে লিখছি এখানে) । ও তখন সকুলে যায় নারায়নগঞ্জে । আমার চেয়ে মাস ছয়েক বড় হবে হয়তো ।

একদিন মা'কে ফোন করে মামা বললেন,

একা একা মুসলমানি করতে ভয় পাচ্ছে, টগর । এক কাজ করলে কেমন হয় ? খোকন (আমার ডাক নাম) আর টগর না হয় একসাথে মুসলমানি করালো, কি বলো ?

মামার কথায় রাজি হয়ে গেলেন আমার মা । ঠিক হলো মামার বাড়িতে থেকে এ কাজটি সম্পন্ন হবে ।

দুভাবে তখন মুসলামানি করা হতো । এক ডাক্তার ডেকে, অন্যটা হাজাম দিয়ে । হাজাম হলো একজন ব্যক্তি যিনি ডাক্তার নন অথচ মুসলমানি করান । আমি ঠিক বলতে পারছি না আর তা হলো, যিনি ডাক্তার নন অথচ কাটা ছেড়া করেন, সেটা আইনের দিক দিয়ে কতখানি সংগত ? কাটা-ছেড়া তো একটা বিরাট শাস্ত্র, যাকে আমরা শল্য চিকিৎসা বলি । যতদূর জানা গেছে, একজন সার্টিফিকেট ধারি ডাক্তার অনেক কাঠ খড় পুড়িয়েই কেবল শল্য চিকিৎসক হতে পারেন । তবে ঘটনা যেটাই হোক না কেন, শল্য-শাস্ত্রে যাই লেখা থাকুক না কেন, মুসলমানি করাতে আমাদের সময়ে হাজামের একছত্র আধিপত্য ছিল ।

রামকৃষ্ণ মিশনে পড়বার সময় থেকে হাজামের সাথে আমি পরিচিত । কেউ হাজামের কথা বললে কান খাড়া হয়ে যেত । তখন গুনে গুনে সব শুনতাম আর মনে মনে প্রস্তুতি নিতাম । বাবা-মার কাছে তথ্য ছিল, হাজাম দিয়ে করালে অনেক তাড়াতাড়ি ঘা শুকিয়ে যায়, ব্যথাও কম লাগে । আর তাছাড়া হাজাম খুঁজে পাওয়াও শক্ত নয় । তাই ঠিক হলো হাজাম দিয়েই কাজটি সম্পন্ন হবে ।

হাজামেরা সাধারণত কাটবার জায়গাটা অবশ করে না (অন্তত আমার সময় দেখিনি) কিন্তু নির্বিঘ্নে কেটে ফেলেন যা কাটবার ।

একদিন মা এসে বললেন,

তোমার আর টগরের কাল মুসলামনি । আমরা সকাল সকাল রওনা হবো, এই বলে মা আমাকে জড়িয়ে ধরলেন ।

আমার মুখ শুকিয়ে এলো কিন্তু সেটা প্রকাশ করলাম না কারণ আমি যে ভয় পাচ্ছি, সেটা দেখাতে লজ্জা বোধ করতাম । কিন্তু মার কাছে গোপন করাটা সম্ভব হলো না কারণ উনি যে আমার আত্মার সাথে মিশে আছেন । অনেকক্ষণ মা চেপে ধরে রইলেন, যতক্ষণ না মাথা তুলছি । বুঝলাম, মারও মুখ শুকিয়ে গেছে, নানা অনিশ্চয়তা ভুগছে সে ।

মাথা তুলে মা বললেন, একদম ব্যথা দেয় না হাজাম । নিমিষেই কাজ সেরে ফেলে । যাবা আর আসবা ।

আমি কিছু বললাম না । মাকে জড়িয়ে বসে রইলাম ।

নারায়নগন্জ

তখন আমাদের ফিয়াট গাড়ি ছিল পুরোনো মডেলের । রঙটা সম্ভবত লাল, পেছনে তিনজন আর সামনে দুজন বসতে পারতো । সেই গাড়ি নিয়ে আমরা রওনা দিলাম নারায়নগন্জের উদ্দেশ্যে । আমার দুপাশে বাবা-মা, আর মাঝখানে আমি । আপাতত আমরা তিনজন যাচ্ছি, পরে ভাই-বোনরা আসবে । ভাই-বোনদের কথা পরে আবারও লিখবো ।

তখন আব্বা ব্যবসা করেন নারায়নগন্জে । প্রতিদিন আব্বা নারায়নগন্জ যায় ব্যবসার কাজে । সকাল নটায় গাড়ি ছাড়ে, বাসায় ফিরতে ফিরতে রাত হয়ে যায় বাবার । দিনভর বাবা থাকেন নারায়নগন্জে । পাটকল, নদীবন্দর আর ব্যবসায়-বাণিজ্যের জন্য নারায়নগন্জ তখন বিখ্যাত । ঢাকা থেকে গাড়ি হাঁকলে চল্লিশ মিনিটে পৌছানো যায়, অন্তত আমাদের সময়ে তাই লাগতো ।

মাঝে মধ্যে বাবার সাথে নারায়নগন্জ যেতাম । ঢাকা-নারায়নগন্জ সড়ক তেমন প্রশস্ত ছিল না তখন, তারপরেও দু তিনটে গাড়ি আসা-যাওয়া করতে পারতো । রাস্তায় নামলে গুটি-কয়েক গাড়ি চোখে পড়তো, তাই আমাদের ড্রাইভার সাহেব রাস্তা জুড়ে গাড়ি হাঁকিয়ে দিত । তবে পেছন থেকে কেউ ওভারট্রেক করতে চাইলে অথবা সামনে গাড়ি এসে গেলে, ড্রাইভার সাহেব বায়ে সরে আসতো, যেন অন্য গাড়িটা অনায়েসে চলে যেতে পারে । এসব দু-একটা বিচ্ছিন্ন ঘটনা ছাড়া, সারা রাস্তা দাবড়িয়ে আমরা নারায়নগন্জে হাজির হতাম । দূর থেকেই চোখে পড়তো তোলারাম কলেজ । এখন অবশ্য সেসব দৃশ্যপট পাল্টে গেছে । নারায়নগন্জ যাবার পথে কতবার যে থামতে হবে অথবা জ্যামে পড়ে যাব, তার হিসেব কেউ দিতে পারবে না ।

যতখানি জানা গেছে, মুসলমানির শুরু থেকে ঘা শুকাতে মোটামুটি সাত দিন লেগে যায়, অবশ্য পুরো শুকাতে এক মাস লাগে অন্তত আমার তাই লেগেছিল । তবে মুসলমানির সুবিধে হলো, এক মাস সকুলে যেতে হবে না, ফলে আনন্দ বোধ করতাম কিন্তু যখনি হাজামের ব্যাপারটা এসে দাঁড়াতো, আনন্দটা মিলিয়ে যেত নিমিষেই ।

একটা সুটকেসে মা সাতদিনের জামা-কাপড় নিলেন । ঠিক হলো আমি আর মা, মামার বাসায় থেকে মুসমানি করাবো আর বাবা যাতায়াতের মধ্যে থাকবে । ভাই-বোনরা আসবে পরে । আমার আবার ভাই-বোনের ঘাটতি নেই । সাত ছেলে-মেয়ে নিয়ে মা-বাবা সাজিয়েছে তাদের সংসার ।

মামার বাড়িটা নারায়নগঞ্জের একেবারে মাঝে দাঁড়িয়ে আছে । যতদূর মনে পড়ে ওটা টানবাজার রোড । এদিকে এগুলে আশা সিনেমা হল আর বাড়ির ঠিক পেছনে শীতলক্ষ্যা বয়ে চলেছে । বাড়িটার চারতলায় টগরদের থাকবার ফ্ল্যাট । ফ্ল্যাটটা লম্বাটে ধরনের, চারটা ঘর পাশাপাশি করা, মনে হয় চারটা বাক্স লাইন ধরে ফেলে রাখা হয়েছে ।

এখনকার বাড়িগুলোতে যেমন প্রতিটি ঘরের প্রাইভেসির ব্যাপারটা গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হয় । যেমন, এক ঘর থেকে অন্য ঘরে যেতে কমোন করিডোর ডিঙিয়ে যেতে হবে অথবা ঘরে ঢুকবার দরজা একটাই থাকবে । আমাদের সময়ে সে সবের বালাই ছিল না । এক ঘর থেকে অন্য ঘরে যেতে ঘরের মধ্যে দিয়ে যেতে হতো । আমাদের সামীবাগের বাড়িতে যেমন দেখেছি, মামার বাড়িতেও তাই দেখলাম । ঘরের তিন দেয়ালে তিনটে দরজা যেন আশেপাশের ঘরে যাতায়াত করা যায়, ফলে দুপুরে যে কেউ একটু ঘুমাবে বা ব্যক্তিগত কাজ করবে, তার ফুরসৎ ছিল না ।

টগরদের ফ্ল্যাটের তিনপাশে ছিল লম্বা বারান্দা । সরু করে বারান্দা করা হয়েছে, এ মাথা থেকে ও মাথা পর্যন্ত । শীতলক্ষ্যার আলো হাওয়া নিরন্তর এসে পড়ছে সেই বারান্দায় । সেই জামানায় আবার বারান্দা ছাড়া বাড়ি চোখে পড়তো না । বাড়িতে বারান্দা নেই অথবা থাকবে না, সেটা ভাবাই যেত না । বারান্দা না থাকলে আলো-হাওয়া আসবে কোত্থেকে ? এখন সে দৃষ্টিভঙির পরিবর্তন হয়েছে । আলো-হাওয়ার জন্য মানুষ আর বারান্দার উপর নির্ভর করে নেই । শীততাপ নিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থা আর উচ্চ ক্ষমতার বাতি সে স্থান দখলে করে নিয়েছে ।

সেই জামানায় এ্যাটাস্ট টয়লেটের ব্যাপারটা বোধ হয় ছিল না অথবা থাকলেও সীমিত আকারে । আমাদের সামীবাগের বাড়িতে যেমন দেখেছি, মামার বাড়িতেও তাই দেখলাম । ফ্ল্যাটের একেবারে শেষে দুটো টয়লেট । হয় বারান্দা মাড়িয়ে অথবা ঘরের ভেতর দিয়ে টয়লেটে যেতে হতো ।

শেষ ঘরটাতে আমাদের থাকবার জায়গা হলো । আমি আর মা পোটলা-পুটলি নিয়ে উঠে এলাম । টগরের সাথে কথা হলো কয়েকদফা কিন্তু আগের সেই উচ্ছলতা নেই কারণ আগামী কালি আমাদের পড়তে হচ্ছে হাজামের খপ্পরে । কেটে কুটে সাবার করে দেবে ও আমাদের ।

।। ৩ ।।

ডুমস ডে

আজ সকাল দশটায় হাজাম আসবে । সকাল থেকেই বাসায় প্রস্তুতি চলছিল । আমাকে সাহস দিতে লাগলেন মা সকাল থেকে । বাবাও চলে এলো সকাল সকাল । ওদিকে দেখলাম টগর দাঁড়িয়ে আছে । আমাকে দেখে মনে হয় একটু হাসলো, তারপর মাথা নিচু করে ফেললো ধীরে ধীরে ।

ঠিক দশটায় হাজাম এলো । লম্বা দাড়িওয়ালা হালকা-পাতলা মানুষ । দাড়ির জায়গায়-জায়গায় লালচে, আবার সাদা-সাদা, সম্ভবত মেহেদি দিয়েছেন ভদ্রলোক । মুখে রক্তিম দাগ লেগে আছে জর্দা-সুপাড়ির । বোঝা গেল অনর্গল পান খান উনি ।

আমাদেরকে হাজামের সামনে হাজির করা হলো । যেহেতু টগর আমার চেয়ে কিছুদিনের বড়, ঠিক হলো ওর মুসলমানি আগে হবে । হাজাম সাহেব ব্যাগ থেকে কিছু একটা বের করে লুকিয়ে ফেললেন যেন আমরা না দেখি । এক ঝলকে দেখলাম লম্বাটে এক খুড়, কালো ডোরাকাটা গায়ের রং ।

আমি যে সময়টার কথা বলছি, তখনো বাংলাদেশের মানুষ মেডিক্যাল সেফটি নিয়ে খুব একটা ভাবতো না । এক খুড় দিয়ে অসংখ্য মুসলামানির ঝুঁকি কতটুকু, সে নিয়ে কেউ মাথা ঘামাতো বলে মনে হয় না । হাজাম সাহেব কি খুড় স্টেরিলাইজ করান ? অথবা উনি কি জানেন স্টেরিলাইজের গুরুত্ব কতটুকু ? এ সম্পর্কে সচেতনতা অথবা সঠিক তথ্যটা তখনো জানা ছিল না, যেমন জানতেন না আমাদের বাবা-মারাও, আর তাই আমাদেরকে হাজামের হাতে ছেড়ে দিয়েছিলেন ।

টগরের সামনে গিয়ে দাঁড়ালো হাজাম । তারপর টগরের সাথে নানা বিষয়ে কথা বলতে শুরু করলো যেমন, কোন স্কুলে পড়া হয়, কেমন লাগে স্কুল, কি খেতে ভাল লাগে ইত্যাদি, ফলে আমরা স্বস্তি বোধ করতে লাগলাম । তারপর আলাপের এক ফাঁকে নিমিষেই কাজ সেরে ফেললেন ভদ্রলোক । এত দ্রুততার সাথে ব্যাপারটা ঘটলো যে, কিছু বুঝবার আগেই কাজ শেষ । টগরকে কোলে করে ঘরে নিয়ে যাওয়া হলো । আমি না দেখলাম কোন রক্তপাত, না হাঁক-ডাঁক । শুধু উহু করে একটা শব্দ বেরুলো টগরের মুখ থেকে, তারপর সব চুপ ।

এবার আমার পালা । আমার সামনে এসে নির্মল হাসি দিল ভদ্রলোক, তারপর নিমিষেই কাজ সেরে ফেললো । ব্যথা পেয়েছি বলে মনে হয় না তবে যে চিৎকারটা বেরিয়ে এলো তা ব্যথা থেকে নয়, আতঙ্ক থেকে । আমাকে কোলে করে বিছানায় শুইয়ে দেয়া হলো । তাকিয়ে দেখলাম, বাবা-মা আর মামা, আমার মুখের উপর ঝুঁকে আছে ।

হাজাম একদম ব্যথা দেয় না - সত্যি কথাটাই বলেছিলেন আমাদের মা । ভদ্রলোক এত ক্ষিপ্রতার সাথে কাজটি সারলেন, তার জুড়ি কোথাও মিলবে না । ভদ্রলোক বেঁচে আছেন কিনা জানি না । কখনো দেখা হলে লম্বা-চওড়া ধন্যবাদ দিতাম । উনার কাটবার স্কিল আমাকে মুগ্ধ করে রেখেছে আজও ।

।। ৪ ।।

মুসলমানি ভাই

টগর আমার মুসলমানি ভাই কারণ আমরা এক সাথে মুসলমানি করেছি । সেই সুবাদে আমার উপর ওর আলাদা দাবি আছে । টগর এখন কত বড় হয়েছে । ছেলে-পুলে নিয়ে সাজিয়েছে সংসার । ঢাকায় গেলে মাঝে-সাঝে দেখা হয় । আগের মতনি আছে, চিকন-চাকন, আভিজাত্যে ভরা চেহারা । চেহারায় টান টান ভাবটা এখনো আছে । বরন্চ আমারি চেহারা ভেঙে চুড়ে গুজো হয়ে গেছে ।

আমাদের মুসলমানি হয়ে গেল নিবিঘ্নে । ঠিক হলো মামার বাড়ি সাতদিন থেকে ঢাকায় ফিরে যাব । মা আমাকে লুঙি পরিয়ে দিলেন । সেই আমার প্রথম লুঙি পড়া । যেহেতু আমরা ছোট ছিলাম, তাই আমাদের মাপের লুঙি পাওয়া যেত না । বাবা গিয়ে বড় বড় থানের কাপড় নিয়ে এলেন । সেই থান কেটে ছয়-সাতটা লুঙি বানিয়ে ফেললেন আমাদের মা । এরি একটা আমাকে পরিয়ে দেয়া হলো । মনে হলো ছোট-খাট একজন বড় মানুষ বিছানায় শুয়ে আছে ।

ও ঘরে তাকিয়ে দেখলাম, টগরও শুয়ে আছে লুঙি পড়ে । আমার সাথে চোখাচোখি হতেই ফিক করে হেসে দিল ছেলেটা । আমিও হাসলাম । প্রাণ খুলেই হাসলাম কারণ হাজামের ব্যাপারটা মিটে গেছে চিরদিনের জন্য ।

এবার শুরু হলো উপহারের পালা । সুন্দর এক সেট খেলনা দিলেন আমার মামা । তারপর কথা অনুযায়ী মা আমাকে পন্চাশ টাকা দিল । সেই জামানায় পন্চাশ টাকা অনেকক্ষাণি, বিশেষত চতুর্থ শ্রেনী পড়ুয়া ছাত্রের জন্য তো বটেই । ঢাকা থেকে ভাই বোনরা আসলো অনেক কিছু নিয়ে । প্রায় প্রতিদিনি কেউ না কেউ আসতো অনেক উপহার নিয়ে । ফলে উপহারের বহর বাড়তে লাগলো কিন্তু মুসলমানির কারণে সে সব খেলতে পারছিলাম না । বিছানায় শুয়ে শুয়ে ভাবতাম কবে এসব খেলবো ।

দিন পেরিয়ে রাত আসে । মাঝে মাঝে বিছানায় উঠে বসি, তারপর অনিমেষ নয়নে তাকিয়ে দেখি শীতলক্ষ্যার দিকে । ঐ যে বিশাল বিশাল জাহাজ ভেসে আছে শীতলক্ষ্যার পাড়ে । একটার গায়ে লেখা Big Lion । লেখাটা দেখে খুব হাসি পেল । জাহাজের নাম আবার Lion হয় নাকি ?

রাত বিরেতে জাহাজের সার্চ লাইট এসে পড়ে আমার জানালায় । তখন উঠে দেখি আবার কোন জাহাজ এলো ? সত্যি সত্যি গাম্বুস সাইজের একটা জাহাজ ভিড়ছে । সারা গায়ে ডোরাকাটা, মাথাটা চোঙা হয়ে উপরে উঠে গেছে ।

যে কদিন মামার বাড়িতে ছিলাম, কত কিছিমের জাহাজ যে দেখেছি, তার ইয়াত্তা নেই ।

চার পাঁচদিন পর থেকে হাঁটতে পারতাম আস্তে আস্তে । টগরকেও দেখলাম হাঁটছে মামির হাত ধরে । তখন থেকে খেলতে শুরু করি বিছানায় । খেয়াল করে দেখলাম, আমার আর টগরের খেলনা একি রকম কারণ যারা আসতেন তারা এক ধরনের দুটো খেলনা নিয়ে আসতেন, যেন খেলনা নিয়ে আমাদের মধ্যে টানাটানি না চলে । আমরা বসে বসে খেলতাম আর বাবা-মা, মামা-মামী, সেটা প্রাণ ভরে দেখতেন ।

দেখতে দেখতে সাতদিন পার হয়ে গেল । আব্বা এসে বললো, ঢাকায় চলো, আর দেরি করা যায় না । ছেলে-মেয়েদের স্কুল-কলেজ বন্ধ হবার পথে ।
মাকে দেখলাম পোটলা গোছাচ্ছে ।
মামা এসে বললেন, আরো সাতদিন থেকে যাও ।
মা হেসে বললেন,

ভাইজান, আবার আসবো । সামীবাগের বাড়ি একদম এলোমেলো হয়ে গেছে । ওদের খাওয়া-পড়ার কষ্ট হচ্ছে ।

আমাদের মা'ই ছিলেন আমাদের সংসারের প্রাণ । সামীবাগের বাড়িতে মা না থাকাতে ঘর-বাড়ি এলোমেলো হয়ে পড়েছিল । মা'কে দেখতাম সকাল-বিকেল ফোন করছে নারায়নগন্জ থেকে । তখন ক্রাডল ঘুরিয়ে ফোন করতে হতো । মা'কে দেখতাম ক্রাডল ঘুরাচ্ছে । পাঁচ-ছয়বার ঘুরানোর পর লাইন পাওয়া যেত ।

আমরা ফিরে এলাম আমাদের সামীবাগের বাসায় । বাসায় এসে মা আমার ঘর গোছাতে লাগলেন । প্রথমে সাবান দিয়ে পুরো ঘর মুছলেন, যেন রোগ-বালাই না ধরে । বিছানায় নুতন চাদর দিলেন, হালকা মোলায়েম নীল রঙের । গাম্বুস সাইজের দুটো বালিশ আগেই রাখা ছিল, যেন হেলান দিয়ে বসতে পারি । এসবের আয়োজন নারায়নগন্জ যাবার আগেই মা করে গিয়েছিলেন, বাকীটা এখানে এসে সারলেন । ভাই-বোনরা হুমরি খেয়ে আমাকে দেখতে লাগলো, ফলে খুব অস্বস্তিতে পড়ে গেলাম, তবে সব কিছু ছাপিয়ে যে ব্যাপারটা আমাকে আনন্দ দিতে লাগলো আর তা হলো, এক মাস সকুলে যেতে হবে না । একটানা খেলতে পারবো এক মাস ।

শেষ

Please write your comments at : sayed.hossain@yahoo.com
My personal website: www.sayedhossain.com
March 30, 2010